মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প 'উদ্ধবের জীবন ও মৃত্যু' : একটি বিশ্লেষণ

দুলালী সরেন

অনুচিন্তন

'উদ্ধবের জীবন ও মৃত্যু' গল্পে মহাশ্বেতা দেবী সাহিত্যিক নিরপেক্ষতায় উপেক্ষিত, অনাদৃত, উৎপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত মানুষের শরিক হয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার ভূমিকা পালন করেছেন। সমাজের অত্যাচারে শোষক শ্রেণির জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে উদ্ধব কীভাবে ছিন্নমূল হয়ে গেছে প্রায় উন্মাদের অবস্থায় উপনীত হয়েছে, তারই মর্মবিদারী-স্বরূপকে গল্পকার আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। উদ্ধবকে শবর শ্রেণির প্রতিনিধি চরিত্র হিসেবে গ্রহণ করে তাদেরকে শোষক শ্রেণি হাতের পুতুলে পরিণত করে এমনকি প্রশাসনিক উপেক্ষায় কীভাবে তাদেরকে দিনাতিপাত করতে হয়, সেটাকেই অভিপ্রায় করে গল্পকার এই গল্পের কাহিনীবৃত্ত, চরিত্রায়ণ এবং সার্বিক গঠন কৌশলকে নির্মাণ করে দিয়েছেন। শবর শ্রেণির সাথে প্রাণপ্রেতির নিবিড় সংসর্গে লেখক গিয়েছিলেন বলেই এমন জীবন ঘনিষ্ঠ নিটোল একটি ছোটগল্প রচনা করতে পেরেছেন।

সূচক শব্দ : ছুরিকাঘাত, উদ্বন্ধনে, বর্ষণমন্দ্রিত, যন্ত্রণাদীর্ণ, দুঃখভার বর্জের নীলাম, ছেনট নির্বিকারত্ব, ক্ষুৎকাতর।

'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সংগ্রহ'-এর পঞ্চদশ খণ্ডের (দে'জ পাবলিশিং প্রকাশিত, জুলাই ২০১৫) মধ্যে সংকলিত একটি অন্যতম গল্প 'উদ্ধবের জন্ম ও মৃত্যু'। গল্পটির প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৮৫ সালের 'অনীক' পত্রিকায়। এই গল্পে মহাশ্বেতাদেবী যেন অকৃত্রিম দৃষ্টিতে জীবনের সঙ্গে জীবনের সংযোজন ঘটিয়েছেন। লোধা, শবর, সহিস, কিরিবুরু-সাঁওতাল হরিজনদের যাপিত জীবনের সঙ্গে তিনি তাঁর সৃষ্টি সম্ভারকে অনায়াসে সংলগ্ন করে দিয়েছেন। নিজের জীবনবৃত্তের প্রাণকেন্দ্রে তিনি এই শ্রেণির জীবনকে কেবল মর্মদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেননি, প্রাণের কেন্দ্র ও জীবনপাত্রের সমগ্রতা দিয়ে তাকে গ্রহণ করেছেন। ইতিহাস তথা কালের সাথে সংলগ্ন করে তিনি এই জাতিগুলির ক্রমবিবর্তনকে শিল্পের আধারে পরিবেশন করেছেন একজন দায়বদ্ধ শিল্পী হিসেবে। সাহিত্য জিজ্ঞাসা শুধু নয়, জীবন জিজ্ঞাসা ও জীবনের মর্মকে তিনি অন্তর্ধারায় গ্রহণ করেছেন বলেই তাঁর একাধিক ছোটগল্পে লোধা, শবর, সাঁওতাল ইত্যাদি জনজাতির প্রাণের কথা, জীবনের কথা; তাদের অভাব-অভিযোগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, পাওয়া না পাওয়া সহ উচ্চবৃত্তের উপেক্ষিত দৃষ্টি এই মানুষগুলোকে কীভাবে অনাদরের দিকে নিয়ে গেছে, তাকে তিনি সহৃদয়তায় আমাদের কাছে প্রত্যক্ষগোচর করে তুলেছেন।

একজন লেখকের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অবশ্যম্ভাবী দৃষ্টিগুণ যদি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়, মহাশ্বেতা দেবীর ক্ষেত্রে তা সর্বাংশে সত্য। তিনি একাধারে সাহসী, দরদী ও যুক্তিপূর্ণ, মানবহিতবাদী ও মানবমুক্তির লেখক বলেই সর্বদা চেয়েছেন মানুষের আত্মজাগরণ। কালের ধারাপাতে সমাজের একশ্রেণির মানুষের শাসন-শোষণ উপেক্ষা, অনাদর, লাঞ্ছনা ও রক্তচক্ষুর দাপটে অত্যাচারে পিছিয়ে থাকা মানুষগুলোর সামনে জীবনমুক্তি তথা আত্মমুক্তির দরজা উন্মোচিত হোক, এটাই ছিল তাঁর আত্মিক প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশা ও বিশ্বাস, হৃদয়ের প্রসন্নতা ও উজ্জ্বলতা, মনীষা ও সহৃদয়তায় তিনি চেয়েছেন উদ্ধব, উকিল ইত্যাদি শবরদের জীবনকে আরো একটি অন্যতর জীবনের প্রাঙ্গণে পৌঁছে দিতে। তিনি হয়েছেন একাধারে বিবেকবান ভাবুক শিল্পী, দায়বদ্ধ মহৎ লেখক, সমাজ-মানুষের মুক্তির অন্যতম পথিক।

গবেষিকা, বাংলা বিভাগ, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্ব-শাসিত)

২

মহাশ্বেতা দেবী প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হলেও আমাদের পরিচিত জীবনের বাইরে এমন অনেক অনাবিষ্কৃত জীবন প্রবাহ রয়েছে যাদের জীবনকে লেখক করেছেন গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়। 'উদ্ধবের জীবন ও মৃত্যু' গল্পের কাহিনী অংশ সামান্য, অথচ এই সামান্যের মধ্যে লেখক তাঁর আত্মপ্রত্যয়ের দিকটি যেন, সচেতন পাঠকের কাছে ছুরিকাঘাতের মতো পৌঁছে দিলেন।

বীরগ্রামে উদ্ধব শবর প্রায় পাগল হয়ে বসেছে। তার কাকা উকিল শবর তা বুঝে উঠতেই পারেনি। উদ্ধব তার স্ত্রীর প্রতি অকথ্য অত্যাচার করে এবং শেষ পর্যন্ত পাঠিয়ে দেয় ঝালপাহাড়ী জঙ্গলের ওপারে তার বাপের বাড়ীতে।

উদ্ধবের জমিজমা লালকুয়া গ্রামের মাহাতোদের কুক্ষীগত হওয়ায় সে প্রায় উন্মাদগ্রস্ত হয়। তার ওপর সে নেশা করে। কোনরকমে সে বউ বাচ্চাকে দু মুঠো খাওয়ার দিতে পারলেও প্রকৃতপক্ষে মাহাতোদের অত্যাচার ও রক্তচক্ষুর কাছে অসহায় হয়ে পড়ে। সেইজন্যে উকিল কাকা তাকে বলেছে–

> "... জমিজমা লালকুয়ার মাহাতোদের গর্ভে গেল। নেশা করে উচ্ছন্নে গেলি, বউটা ছেলেমেয়ে নিয়ে খেটেপিটে এসে খাওয়াত, তাকেও তাড়ালি, এখন মরবি না কি ?"[১]

উদ্ধব শবর দিনের অধিকাংশ সময় নেশাগ্রস্ত রক্তবর্ণ চোখে বেহুঁশ হয়ে থাকে। তখন ও নিমপুরে হাসপাতাল হয়নি, হয়েছে ঝাড়গ্রাম হাসপাতাল কিন্তু উদ্ধব করমঠাকুরের কৃপায় তার মাতৃগর্ভে জন্মলাভ করেছে। আদিবাসী জাতির করম ঠাকুর হলো একটি অন্যতম দেবতা। উদ্ধব মনে করে তার বয়স পাঁচশ বছর। এর কারণ মায়ের চার ছেলের মৃত্যুর পরে সে হয়েছে পঞ্চম সন্তান। করম ঠাকুরের কাছে উদ্ধবের মা গোপালি প্রত্যেক সন্তানের জন্য শতবর্ষ প্রার্থনা করে চারশ বছর পেয়েছে আর উদ্ধবের হয়েছে একশ বছর। উদ্ধব জানিয়েছে– "মা যেমন বলল তাই বলি। তা ঠাকুর বলল, তোর চার ছেলে থাকলে শতবর্ষ বাঁচত। তাদের আয়ু তোর পেটেরটাকে দিলাম। এর আয়ু একশত, তাদের চারশত, এ পাঁচশো বছর বাঁচবে।"

উদ্ধবের পরিবারের সমস্ত কিছু এমনকি ছাগল পর্যন্ত নিয়ে নিয়েছে লালকুয়ার মাহাতোরা। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে সেখানে মাহাতোরা থাকবে না, সেখানে তার ঘরের সামনের গাছে দঁড়িতে বাঁধা থাকবে ছাগল, যেখানে শবরদের জন্য জমিজমা থাকবে, থাকবে এক নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব জীবন-যাপন। এই সূত্রে লেখক চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতুর অনুষঙ্গকে প্রাসঙ্গিকভাবে নিয়ে এসেছেন। উদ্ধবের কথায় লেখক সেই কালকেতুর কিরাত জীবনের মাঝখানে যে যাপিত জীবনের চিত্র ছিল তাকেই হাজির করেছেন। উদ্ধব বলেছে কাকা উকিল শবরকে–

> "তোর সকল কথা মিছা রে বুড়া ? অজগর বন ছিল না ? কালকেতু নীল গন্ধরাজ খুঁজতে যেয়ে বনচণ্ডীর কৃপা পায় নাই ? গড়ে নাই শবর সাম্রাজ্য ? যেথা লধা-শবর স্বাধীন থাকত না ? যার যার ঘর আছে, গাছে ছাগল বাঁধা আছে, বন সকলকে অন্ন দেয়, ছিল না এমন দিন ?"[২]

আজকের দিনে গভীর অরণ্যপ্রদেশ ছেড়ে দলে দলে হাতি মানুষের মাঝখানে ও মানুষের ধানজমির মাঝখানে চলে এসেছে। এর জন্য লেখক হাতিদের দোষ দেন নি তিনি মনে করেন মাহাতোরাই জঙ্গল বিনষ্ট করে চাষের জমি তৈরি করেছে যেন পরোক্ষে শবরদের মেরে ফেলা হয়েছে, বিনষ্ট করা হয়েছে শবর সাম্রাজ্যের স্বাভাবিক স্বরূপকে।

উদ্ধব তার শবর জীবনের চাওয়া পাওয়ার বিনষ্টির মাঝখানে মাঝে মাঝে ক্ষেপেই ওঠে। উকিল কাকা মনে করে তার জীবনাচরণের মধ্যে হয়তো কু-বাতাস লেগেছে। সেইজন্য সে তাকে স্নান করাবে, খাওয়াবে এবং ঝেড়ে দেবে।–

> "তোরে আমি স্নান করার, খাওয়াব, তারপর ঝেড়ে দিব। কু বাতাস লেগেছে বই তো নয়।"[৩]
> "ঝাড়ফুঁক দেওয়া লোকায়ত জীবনের এক বিশ্বাস। এর মধ্য দিয়ে তাদের জীবনের পরিশুদ্ধি ঘটে যায়।"[৪]

সরকারের পক্ষ থেকে শবরদের নামে কুঁয়া আসে, এমন কি বীরগ্রামের জন্যে ঘর বরাদ্দ হয় অথচ মাহাতোরা ছলে বলে কৌশলে সমস্ত কিছুকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে দেয়। লোধা, শবর জাতির সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উন্নতি মাহাতোদের আক্রোশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ভূমিহীন, নিরন্ন নেশাসক্ত উদ্ধব সমস্ত প্রতিকূলতার মাঝখানে একসময় লুঙ্গিগলায় দিয়ে রাতের অন্ধকারে উদ্বন্ধনে মৃত্যুর পথ বেছে নেয়। শেষপর্যন্ত মাহাতোদের জন্যই উকিল শবরদের কোমরে দড়ি পড়ে। মাহাতোদের কথাতেই পুলিশ তাদেরকে জিপে তুলে নিয়ে যায়। উকিলরা বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রোপণ করা জমির দিকে। দুটি শীর্ণ বলদের দিকে দড়িতে বাঁধা ছাগলের দিকে। লেখক জানিয়েছেন–

> "সর্বজ্ঞ পুলিশ উকিলদের কোমরের দড়ি টানে। উকিল বড়ো অন্ধকার গহ্বরে ডুবে যেতে যেতে পিছনে চায়। ওই রোহিন্ করা জমি, শীর্ণ বলদ দুটি, দড়িতে বাঁধা ছাগল, এদের সঙ্গে ওর শেষ দেখা সেরে নেয়।"[৫]

উদ্ধবের মৃত্যু সকল শবরের বুকে পাথরের মতো বেজে উঠে। আসলে উদ্ধবের মৃত্যু কোন সহজ সাধারণ মৃত্যু নয় তার মৃত্যু হয়েছে অত্যাচারী শোষক শ্রেনী মাহাতোদের বিরুদ্ধে নিঃশব্দ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ইঙ্গিতবাহী। মহৎ শিল্পীর এক সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে মহাশ্বেতা দেবী উদ্ধবের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শবর জাতির আত্মজাগরণের আত্ম উদ্‌বোধনের আত্মস্বীকৃতির বীজমন্ত্র রোপণ করে দিলেন। বালিভাসা, গুপ্তমণি, মানিকপাড়া, নিমপুরা, ঝাড়গ্রাম, চিল্কিগড়, জামবনি প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাসকারী শবর জাতির শরীক হয়ে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিদিনের যন্ত্রণাদীর্ণ জীবনের স্বরূপকে সচেতন পাঠকের হৃদয়ের কাছে তুলে ধরেছেন। সাহিত্যিক নিরপেক্ষতায় তিনি এক সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। বিবেকানন্দ 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে একসময় বলেছিলেন শূদ্রজাতির আত্মজাগরণের কথা, মহাশ্বেতাদেবী যেন এ যুগের কথাকার হয়ে শবর তথা সমস্ত আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার এবং সমাজের বুকে তাদের বাঁচার স্থায়ী ঠিকানা তৈরি করে দিতে চেয়েছেন। উদ্ধবের মৃত্যু সেই প্রেরণা ও প্রত্যয়ের চাবিকাঠি স্বরূপ।

উদ্ধবের ঈশ্বরবিশ্বাস তাকে সংস্কারের অনুবর্তী করে। তার অসহায়তা বারবার ঈশ্বরের কাছে প্রতিহত হওয়ার যন্ত্রণাকে সত্য করলেও যে যখন মৃত্যুতেই সকল যন্ত্রণার সমাপ্তি বলে ভেবে নেয়, তখন সে নিজেরই আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। তার মনোলোকের দুঃখভারজর্জর যুক্তিচিন্তা অসহায় ঈশ্বরের পায়ে নিবেদিত হয়ে শেষ হয়ে যায়। সংস্কারের ইতিবাচক দিকগুলিই তার কাছে মান্য হয়। বালককালে একেবারে প্রথম দিকে মায়ের স্মৃতির অনুষঙ্গ, সেখানে নিজেকে যেমন-পাঁচশো বছরের মনে করেছে। তেমনি নিয়তি-নির্দিষ্ট এক অভিমান রহস্যকে ঈশ্বর প্রসঙ্গে

মেনে নিয়েছে। তার কাছেও ক্রমশ বিশ্বাস্য হয়ে উঠেছিল সে বহু বছর বেঁচে গিয়েছে এবার তার মরণকাল। কাকা উকিল শবর উদ্ধবের বউ তাড়ানোর খবর বকতে এলে–

> "উদ্ধব শুনছিল, মাথা নাড়ছিল সব শুনে ও রক্তবর্ণ চোখ তুলে বলল, মরব না তো পাঁচশো বছর বাঁচলাম, আর কত ?"[৬]

আসলে বাইরের ঘটনার সঙ্গে উদ্ধবের মনের সংস্কার ভাবনার যোগের যে নির্ভুল coincidence তাই তাকে দীর্ঘজীবন অতিবাহিত হয়েছে এমন বিশ্বাস যোগায়।

পিতা মাতার কাছ থেকে সন্তান প্রথমে সংস্কার পায় এবং পরবর্তীতে তা বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়। আদিবাসী সম্প্রদায় এক আদিম জীবন যাপন করেছে এবং সে জীবনধারাকে অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা ও আপ্রাণ। উদ্ধবের মা গোপালি তার আরাধ্য করম দেবতার গল্প তার পঞ্চম সন্তান উদ্ধবকে শুনিয়েছে। সেই গল্পের বিশ্বাসের সঙ্গে চমৎকারভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছে উদ্ধবের জন্মরহস্য। করম ঠাকুরের পুজো আসলে আনামী দিনে সুসন্তান ও ভালো ফসলের কামনার প্রতীকী আয়োজন বলা চলে।

এই ধারণা সাধারণ মানুষের অলৌকিক দেবী সংস্কার থেকে জন্ম নেওয়া এবং লোকের মুখে মুখে সেই প্রাচীন কাল থেকে প্রচারিত হওয়ার বিষয়। উদ্ধবের মা বিশ্বাস করে যে করম ঠাকুরের কৃপায় সে উদ্ধবকে লাভ করেছে। মা বলল–

> "উদ্ধব রে! তুই পেটে আসতে আমি করম গাছের তলায় বসে কাঁদছিলাম। তা তোর বিশ্বাস যাবে না, করম ঠাকুর ডাকল। বটে! কী বলল ? বলল, কাঁদিস না কাঁদিস না গোপালি! কেঁদে কেন মর ? মা বলল পেটের মাটি ঘরে আর মরে গো ঠাকুর। সেই দুঃখে কাঁদি। ....
>
> তা ঠাকুর বলল, তোর চার ছেলে থাকলে শতবর্ষ বাঁচত। তাদের আয়ু তোর পেটের টাকে দিলাম। এর আয়ু একশত, তাদের চারশত, এ পাঁচশো বছর বাঁচবে।"[৭]

উদ্ধবের কাকা উকিল শবর এবং উদ্ধবের স্ত্রী উদ্ধবের পাগলামোর অন্তরালে দীর্ঘলাঞ্ছিত শবর জীবনের কথাকে অস্বীকার করে অন্ধবিশ্বাসের জীর্ণজালে আবদ্ধ থেকেছে। উকিল শবর মনে করে উদ্ধবের গায়ে কু-বাতাস লেগেছে। তাই সে তাকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে। স্নান করায়, পেটভর্তি ভাত খাইয়ে ঝাড়ফুঁক করে দেয়।

অপরদিকে উদ্ধবের স্ত্রী অর্থাৎ মাতির মা ও ধানঘর তার বাপের বাড়িতে বসে উদ্ধবের কথা ভেবেছে। এবং কোন্দলালের কাছে বলে পাঠিয়েছে উদ্ধব পাগল নয়। কেউ ওষুধ করেছে, বা কি খাইয়ে দিয়েছে। মাতির মাও তাই গুনিন ও ওঝা ধরছে, দৌড়চ্ছে। যদিও ভূমিহীন, নিরণ্ন, নেশাসক্ত উদ্ধবকে নষ্ট করে কারও লাভ হবার কথা নয়, তবু প্রাচীন ধারণার বশবর্তী হয়ে মাতির মায়ের এমন ভাবনাই মনের মধ্যে প্রকট হয়েছে।

আসলে গল্পের পরতে পরতে লোকায়ত আচার-বিশ্বাস ছড়িয়ে রয়েছে। লেখিকা প্রসঙ্গক্রমেই এই চিরাচরিত প্রথাকে বাদ দেননি। যে সমাজ চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন তাতে লোকবিশ্বাস, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার বা বিশ্বাসের সদর্থক দিক ছাড়া এ আদিম জীবনের ছবি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই কখনো কখনো উদ্ধবকেই বনদেবতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে–

"দেখ তো কেমন শান্ত মাজুন। যেন কিছু জানে না। ওর যা বয়স, সেই বয়সেই ওর বাপ মরেছিল, ওর পিতামহ ও মরেছিল। উদ্ধবকে যেন তাদের মতো দেখায়। কটাশে কোঁকড়া চুল লতা হয়ে কাঁধ অবধি। ঘর থেকে থেকে গায়ের রং আবার কাটাশে। পিংলা চোখ, কটাশে ভুরু। যেন উদ্ধব নয়। যেন শবরদের পুজিত কোনো বনদেবতা ছলনা করে এসে বসে আছেন।"[৮]

পিংলা চোখ, কটাশে ভরু বন্য জন্তুর মতো তার দৃষ্টি। লোকে তাকে বিকৃত দৃষ্টিতে দেখে নিজেদের সংস্কারকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সে নির্জনে থাকে। না পাওয়ার বেদনায় তার মেজাজ মাঝে মাঝেই রুম, প্রতিবাদী। সমাজের কাছে যাবতীয় উপেক্ষা, অপমান, তার বয়সের রুক্ষ জটিল দিক তাকে প্রায় পাগল করে দেয়। তাকে পাগলের মতো করে বাইরে পাগল বানিয়ে এক নিঃসঙ্গ জীবনের ছবি এঁকেছেন লেখক।

মহাশ্বেতা দেবী গল্পের বিভিন্ন স্থানে গল্পের রসদ হিসেবে ব্যবহার করেছেন নানান লৌকিক দ্রব্য ও লোক ঔষধকে। নিমতেল, কাঁচা হলুদ ইত্যাদি। নিমতেল মাখলে মাথা ঠাণ্ডা হয় বলে আদিবাসী সমাজের মানুষরা বিশ্বাস করেন। সেইজন্য উদ্ধব নিমতেল মেখে স্নান করেছে।

গল্পে উদ্ধবের চরিত্রের অন্তিম পরিণতিতে আছে নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু তার বিষাদময়তা প্রমাণ করে, তার মৃত্যু নয়, মৃত্যুকে কেন্দ্র করে একালের তথা চিরকালের মানবগোষ্ঠীর আর এক মানুষেরই প্রতি ঘৃণা, উপেক্ষা, অমানবিক কঠিন যন্ত্রণাবিদ্ধ আচরণের জীবন্ত প্রতিচিত্রণ। উদ্ধবের ছিল নিরন্তর সুস্থ জীবনের জন্য, নিঃসঙ্গ। নিজের মতো করে গড়া জীবনের জন্য আর্তি। বেঁচে থাকার আর্তিতেই সে বারবার উন্মাদগ্রস্ত হয়েছে। নিজের সংসার গড়েও সে সেখানে থাকতে পারেনি, রক্ষা করতে পারেনি। তার মৃত্যু চিত্র নির্মম ও অসহনীয়।

৩

'উদ্ধবের জীবন ও মৃত্যু' গল্পের ভাষায় মহাশ্বেতা দেবী ঝাড়খণ্ডী উপভাষার অর্থাৎ মূলত দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়া পুরুলিয়া, বিহার ও ঝাড়খণ্ডের কিছু অঞ্চলের বিশেষ ভাষা-বৈশিষ্ট্য যোগ করেছেন চরিত্রদের সংলাপে। গল্পটি বিবরণধর্মী গদ্যরীতিতে লেখা। এই ভাষার গতি বর্ণনার বেগে তীব্রতা পেয়েছে। সামগ্রিকভাবে প্রকাশরীতির মধ্যে আছে স্পষ্টত নিবিড় ঘন ব্যঞ্জনা। এ গল্পের শিল্পকাঠামোয় মহাশ্বেতা দেবী গল্পকার ব্যক্তিত্ব অসাধারণ সংযম ও সুষমার আকর্ষণীয়। ছোট ছোট বাক্য দিয়ে গঠিত হয়েছে তার রচনারীতি। দু-একটি বাক্যের উদ্ধৃতিতেই তার প্রমাণ মেলে। যেমন–

"টাকা কোথায়, বাবু ?
ওর নাই তো তোর আছে।
কি আছে বাবু ?
জমি আছে, গরু আছে।
সব বেচলে খাব কি ?
তবে মর্‌গা যা।
মরেই তো আছি বাবু। শবররা কি বেঁচে আছে ? তার উপর উদ্ধবটা ..."[৯]

মহাশ্বেতা দেবী জীবনের একটি বৃহত্তর পরিসরে এই শ্রেণির মানুষের সঙ্গে নিবিড় নৈকট্যে ছিলেন বলেই তাঁর ভাষা এমন প্রাণধর্মী হয়ে উঠেছে। গল্পটিতে তিনি একদিকে যেমন গভীরভাবে জীবনকে অবলোকন করেছেন তেমনি জীবনের সঙ্গে যুক্ত ভাষাকে ও আমাদের হৃদয়ের দুয়ারে পৌঁছে দিলেন। গল্পের অন্তিম অনুচ্ছেদটির বাক্য গঠন। সংক্ষিপ্ত বাক্যের ব্যঞ্জনা ও তির্যক স্বভাব বর্ণনার অমোঘতা, পরিমিতবোধ ও ক্লাইম্যাক্সের শ্বাসরুদ্ধকারী গভীর রূপসৃষ্টি লেখকের ভাষা গঠনের অসামান্য দক্ষতার পরিচায়ক।

৪

'উদ্ধবের জীবন ও মৃত্যু' গল্পে কেন্দ্রীয় গল্পটির আখ্যানের কাঠামোয় নেই। প্রেক্ষিতের বৈরী স্বভাবে নেই, প্রথাবদ্ধ চরিত্রের উতরোল উচ্ছ্বাসে নেই, আছে সংক্ষিপ্ত মাপে, শিল্পের সংযমে ও শাসনে চরিত্রের ছোটমাপের মধ্যে তাৎক্ষণিক অর্জিত অভিজ্ঞতায়। অন্তত গল্পে উদ্ধব যে গল্পকারের একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি– তার 'চলন' ধর্মে ও মনের অস্থির স্বভাবে ক্রমিক শূন্যতা এবং নির্জনতা এবং মৃত্যুবোধে, শেষে শবর জাতির জন্য অন্তঃশীল আর্তি, বেঁচে থাকার বাস্তবিক কোন ইচ্ছা না থাকায় গলায় ফাঁস নিয়ে মধ্যরাতে মৃত্যুবরণ একটি সমগ্র জীবনধর্মের রূপাবয়ব তুলে ধরে।

উদ্ধব নিজেকে নানাভাবে যেন বা কষ্টিপাথরে যাচাই করেছে। সে কি চায়– শুধু অরণ্যময় জীবন না আরও কিছু – তাঁর খোঁজে সে গল্পকারেরই সন্ধানী আলোর কাজ করেছে। সে নিরাসক্ত ও উদাসীন, প্রতপ্ত, নিটিকার। নিষ্ঠুর নির্দয় লালকুয়ার মাহাতোদের আচরণে ব্যথিত, অখুশি থেকে হলদি নালা, ঝালপাহাড়ীর জঙ্গল তার তীরবর্তী তার জন্মকেন্দ্র বীরগ্রামের কথা, মায়ের কথা ভেবেছে নিবিড় এবং অনুষঙ্গ দিয়ে–

মা বলল, উদ্ধবরে! তুই পেটে আসতে আমি করম গাছের তলায় বসে কাঁদছিলাম। তা তোর বিশ্বাস যাবে না। করম ঠাকুর ডাকল। বটে! কী বল ?[১০]

বলল, কাঁদিস না কাঁদিস না গোপালি : কেঁদে কেন মর ? মা বলল, পেটের ছেলে মাটি ধরে আর মরে গো ঠাকুর, সেই দুঃখে কাঁদি।

উদ্ধব অর্থাৎ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র এমন কথা ভাবে সে বেঁচে থেকে বীর গ্রামের ঘটনা ও অন্নিহিত অভিজ্ঞতার চাপে একটি মেয়ে মাতি এবং ছেলে মলেনকে খাওয়ানোর দায়িত্ব তাঁদের নিজেদের ঘাড়ে তুলে দেয়। উদ্ধবের পিতা তার বয়সেই মারা গেছে এই বিপর্যস্ত পরিবেশে অসহায়।

আবার গল্পের শেষে লালকুয়া গ্রামের ষড়যন্ত্রে উকিলদের কোমরে দড়ি বাঁধা পড়ে। দড়ির টানে বীরগ্রামের সর্দার উকিল বড়ো অন্ধকার গহ্বরে ডুবে যেতে যেতে পিছনে চেয়ে দেখে। অন্ধকার ঢাকা পরিবেশে একটা মানুষ অসম্ভব যন্ত্রণায় অনুভব কবে উদ্ধর বুঝি হিসাবের পাগল ছিল না। ওর বেদনার সঙ্গে বাকি শবরদের পরিচয় ছিল না। বুঝি সে পাগলা হয়ে সত্যি কথা বলে গেল। এইসব ভাবনায় যে মানবতাবিরোধী অনন্বয় তখন। তা উদ্ধবকে ক্রমশ এক শূন্যতার দিকে ঠেলতে থাকে। উদ্ধবের মধ্যে দেখা দেয় ভয়, তার ছায়া, আর ছায়া বোধ হয় মৃত্যুর। এমন শূন্যতার ফেরে উদ্ধব কোঁদা সরেনের ওষুধ খেয়ে লোহার কলা পরে শান্ত হয়ে ঘরে এল। ছেলের কাছ থেকে ভালোবাসার শান্ত্বনা পেয়ে প্রতিশ্রুত হয় আর সে গলায় ফাস নেবে না। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র এই উদ্ধবের দৃষ্টিভঙ্গি ধরেই এক

বাস্তব সত্যে প্রস্তরচিহ্ন রূপ পায়। সে বীরগ্রামের শবরদের অতীত জীবন, তার লাবন্য ভরা শান্ত নিরিবিলি মাতৃসমা অরণ্যের সান্নিধ্য কামনা করে। উদ্ধব তথা গল্পকারের জীবনবেদের ধর্মে প্রতীক হয়ে যায়।

এবং এটাই স্বাভাবিক। গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে স্বভাবে জড়িত থাকে গল্পকারের খষ্ষ্ত-ষ্সগঙষ্বনতচঙ– জীবনভাষ্য। 'উদ্ধবের জীবন ও মৃত্যু' গল্পের জীবনভাষ্য এসেছে প্রতীক প্রতিম স্বভাবে। উদ্ধব চরিত্রটি যুগ যুগ ধরে অত্যাচারিত শবর-জীবনের প্রতীক স্বরূপ। যে দীর্ঘ শাসনের নিষ্পেষণে মস্তিষ্ক জনিত বিকারের শিকার হয়েছে। এবং গল্পের একেবারে শেষে উকিল শবরের উপলব্ধি হলদি নালার জলের ঝরঝর ও মৃত উদ্ধবের কথার আবহসঙ্গীত সকল শবরের বুকে পাথরে পাথরে বাজে।

৫

'উদ্ধবের জীবন ও মৃত্যু' গল্পে চরিত্রের কোনো ভিড় নেই, এবং যে রীতিতে গল্পটি লেখা– তাতে ভিড় না থাকাই স্বাভাবিক। টানা গল্প ও ঘটনার আড়ম্বর ও উজ্জ্বল দিক থাকলে চরিত্র ভিড় জমাবার সুযোগ পেত হয়তো, কিন্তু এ গল্পের লক্ষ্য আলাদা। মহাশ্বেতাদেবীর একাধিক গল্পে চরিত্র আঁকার এক নিজস্ব রীতি আছে। সেই রীতিতে অবশ্যই এ গল্পের চরিত্র বিচার্য হতে পারে না। তবে উদ্ধবের জীবন ও মৃত্যু গল্পে একটিমাত্র চরিত্র যে উদ্ধব, তার গুরুত্ব বাইরের ভিড়ে একাধিক ডাইমেনশানে ব্যাখ্যা পায় না। উদ্ধব একাই তার জীবন ও মৃত্যুর প্রেক্ষিতে ছোট বড় সব মাপের মানুষজনকে নিজের কুক্ষিগত করেছে।

উদ্ধবের স্রষ্টা গল্পকারের উদ্দেশ্য ও তাই। গল্পে একা উদ্ধব, কিন্তু তার প্রত্যক্ষ বিবর্তন আছে যা আগের নির্দিষ্ট পরিকল্পনার কোনো আনুগত্য প্রকাশ করেনি। উদ্ধবের মধ্যে শবরদের ফেলে আসা অরণ্যজীবন ও বেঁচে থাকার জন্য তিলেক মাটি গাছে বাঁধা ছাগল, হলদি নালার জল নানাভাবে তাড়িত করে। তার মনের মধ্যে যে নস্ ালজিয়া- তার অনুগ থেকেছে বাস্তবের অভিজ্ঞতা। বাস্তব ও স্মৃতি এই দুই বোধের সংঘাতে এক এক করে উদ্ধবের ঘটেছে বিবর্তন। তার এই বৈশিষ্ট্য তাকে বাধ্য করেছে কয়েকটি উপলব্ধির জগৎকে স্বভাবে জড়িয়ে নেওয়া। ১. উদ্ধব যেহেতু এতদিনের জীবনে অরণ্যকেন্দ্রিক গ্রাম্য জীবনের মানুষ, তাই তার মধ্যে এমন নস্ ্যালজিক স্মৃতিরোমন্থন স্বাভাবিক। ২. উদ্ধব বাস্তবের পোড়খাওয়া জীবনে এসে বেশি বিভ্রান্ত হয়েছে, কারণ তার পরিপার্শ্ব থেকে শূন্যতার শিক্ষা অর্জনই দায়ী। ৩. সে ক্রমশ হয়েছে নিরাসক্ত, নিস্পৃহ,– কারণ তার মূলে আছে বাঁচার উপযোগী নিরাপদ জীবন সংস্থান না করতে পারা, ৪. যেহেতু উদ্ধব লেখকের সচেতন দৃষ্টি, তাই তার মধ্যে গল্পের গতি সৃষ্টির উপযোগী আছে প্রবল মননক্রিয়া। ৫. যখন উদ্ধব সদ্যোস্নাত নতুন উদ্ধব। কাকার দাওয়ায় বসে এক থালা হতে খায় ভাত, শাকসিদ্ধ, ঢেমনা সাপের ব্যঞ্জন। তারপর বিকেলে শোরগোল-শোরগোল! মলেন, উকিলের ছেলেরা, গ্রামের পাঁচজন উকিলকে হতভম্ব করে দেয়। ওদের সঙ্গে উদ্ধব। ঘাম মুছে নেটল মাহাতো বলে, মার শালারে জুতো! ওঃ চোখ বুজে গান ধরেছি কি ধরিনি, বেটা উদ্ধব চিল চিৎকার দিল পাচশত বছর বেঁচে আছি, আজো ভাগের ছাগলটা খুলে নিয়ে যায়। এ জীবন আমি রাখব না হে! উদ্ধব প্রহৃত হয়ে ভাঙা মন নিয়ে ফিরে আসে ভিতরে মৃত্যুর ছায়া মেশানো ভয় নিয়ে– তখন শূন্যতা থেকে মুক্তির জন্য হয় আর্ত। ৬. উদ্ধব বিবর্তনে ওপরের চিহ্নিত দিকগুলির একটা নিরসনের রূপ পায় উদ্ধবের সব বিচারের শেষে তার মৃত্যু চেতনায়।

অর্থাৎ যে ছিল গোড়া থেকে কল্পনাময়, সে হয় শেষে কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন। তখনি সে বীভৎস ও ভয়ঙ্কর

চিৎকার করে আর্তনাদকে একমাত্র উপায় ভাবে, তিলেক ঠাঁই নেবার জমিটুকু, ঘরের ছাগল ঘরে বাঁধা থাকুক চায় এটাই তার চরিত্রের বিবর্তনের বড় ধাপ। এমন অবস্থায় তার বাস্তব রূপ–

"মুখের বিরাম নেই। নিচু গলায় কথাও বলেই যায়।
মলেন ও মাতির কানে কথাগুলি সয়ে যায়।
বর্ষা এখন এখানেও। হলদি নালার বারবারের মতো
উদ্ধবের কথা ও যেন বর্ষার আবহসঙ্গীত।
– পাঁচশত বছর বাঁচা হয়ে গেল...
– ওই, ওই শোন্ হাতি ডাকে। কালকেতুকে খুঁত...
– মহুল গাছে ছাগল রাঁধলাম, খুলে নিল...
তেঁতুল গাছে ছাগল বাঁধলাম, খুলে নিল...
– পাঁচশত বছর এই এক বস্তু দেখে দেখে ... দেখে দেখে...
দেশে কোথা তিলেক মাটি নাইরে যেথা শরব
মানুষ একটা গাছ পুঁতে, একটা ছাগল কাঁধে, বেঁধে ঘুম যায়...
কাঁকড়া লকেরা সকল নিল... সকাল...।"[১১]

এই যে শঙ্কিত রোধের জাগরণ, সে ভয় থেকে মুক্তির পথ সে খুঁজে পায় মৃত্যুর মধ্যে। কেমন একটা ভয় কালো ছায়াচ্ছন্ন করে তুলেছে তার সারা অন্তর, সে ছায়া কী মৃত্যুর ?

এই যে নিশ্চিতভাবে বেঁচে থাকার অনিচ্ছা এবং মরতে চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়ার ভাবনা এখানেই চরিত্রের নির্মম বাস্তবতা নিহিত।

'উদ্ধবের জীবন ও মৃত্যু' গল্পের চরিত্র পরিকল্পনা মহাশ্বেতা দেবীর চরিত্র সৃষ্টির অভিনবত্বের দিককে প্রতিষ্ঠা দেয়। একই সঙ্গে শিল্পীর কল্পনাশক্তি, পর্যবেক্ষণ শক্তি ও অভিজ্ঞতা নামক মূলধন একসঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সমীকৃত হলেই এমন শিল্প বাস্তবতার চরিত্র হয়ে ওঠে। গল্পকারের এই গুণেই উদ্ধবের জীবন ও মৃত্যু গল্পের শিল্প সমৃদ্ধি রীতিমতো চমৎকারিত্ব আনে।

৬

মহাশ্বেতা দেবীর 'উদ্ধবের জীবন ও মৃত্যু' নামের গল্পটির শীর্ষনাম একটি বিশেষ চরিত্র ধরে চিহ্নিত হয়েছে। এ গল্পে উদ্ধবের জীবন ও মৃত্যুকে– তাকে লক্ষ্য রেখেই প্রধান করা হয়েছে। আমরা জানি কোনো সৃজনধর্মী সাহিত্যের বিশেষ নাম সৃষ্টির কেন্দ্রীয় লক্ষ্যকে নির্দিষ্ট করে হতে পারে, যদি গল্প বা উপন্যাস হয় তবে নায়ক-নায়িকা বা প্রধান চরিত্র সূত্রে হতে পারে, বা বিষয়ের ব্যাখ্যাশ্রয়ী হতেও নামের দিক থেকে কোনো আপত্তি থাকে না।' উদ্ধবের জীবন ও মৃত্যু' একটি মৌলিক গল্প, তাই তার নামকে কেন্দ্র করেই গল্পের আবর্তন।

একটু অভিনিবেশে দেখলেই বোঝা যায় গল্পের এমন নাম গল্পেরই বিষয়নিহিত বিশেষ জীবনকে অবলম্বন করেছে।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, গোটা গল্পটিই তো বিশ শতকের– শবর জীবনের পটভূমি নিয়ে লেখা। তার অন্তর্নিহিত বিষয়-ভাবনা, সামান্য কিছু চরিত্র বীরগ্রামের শবর এবং লালকুয়ার মাহাতোদের সাথে সংশ্লিষ্ট, তাতে উদ্ধবের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাই মূল লক্ষ্যে তা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

৭

গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্য এখানে শবরদের জীবন হলেও গল্পের ফলশ্রুতি আছে সব শেষের চিত্রে– যদিও গ্রামের প্রতীকী ভাবনা উদ্ধবের একটানা চিন্তার মাধ্যমে বীরগ্রামের শবর জীবনের তাৎপর্যকে প্রধান করে তুলেছে, শেষ চিত্রে উদ্ধবের মৃত্যুর ব্যঞ্জনাই মূল বিষয়ের স্বপক্ষে লক্ষ্যভেদী হয়েছে। লালকুয়ার মাহাতোদের (বহিরাগতদের) শোষণে উদ্ধবদের অস্থির অবস্থা, লাঞ্ছিত জীবনের ইঙ্গিত থাকলেও উদ্ধবের মৃত্যু যেন শবরদের জাগ্রত করতে ভুলে যায়নি। তাই শেষ চিত্র ধরে এমন গল্পনাম অসার্থক নয় শিল্পের মানে। গল্পের প্রচ্ছন্ন নায়ক ভাবনায় তা মানিয়ে যায়।

'উদ্ধবের জীবন ও মৃত্যু' নাম শুধু উদ্ধবের নাম নয়, তা হয়েছে সমগ্র গল্পের পক্ষে এক সার্থক শিল্প লাবণ্যে বর্ণময় প্রতীক। অরণ্যকেন্দ্রিক গ্রাম্য শবরদের উপেক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে– যেখানে গ্রাম্য পরিবেশে বঞ্চিত শবর মানুষজন, লালকুয়ার কাঁকড়া লোকেদের (ধূর্ত বহিরাগতদের) নির্দয় আচরণ, উপেক্ষা, নির্বিকারত্ব উদাসীনতা– সেখানে সাধারণ শবর মানুষের জীবন ধারণের অসহায়তা আসে– তাতে ছেড়ে আসা (বিতাড়িত হওয়া) অরণ্য জীবনের কথা তো নস্ট্যালজিক স্বভাবে সচেতন মনে আসতেই পারে। উদ্ধব সেই সচেতন এক শোষিত, লাঞ্ছিত, অরণ্যতাড়িত মানুষ। তার ক্ষুৎকাতর জীবনার্তিতে শুধু নিজস্ব জীবন বাসনা একমাত্র হয়নি, তার সঙ্গে শবরদের অরণ্য জীবন-স্বভাবের রোমান্টিক আকর্ষণ অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

গল্পের নাম দিয়েছেন লেখক স্বয়ং। তাঁর লক্ষ্য কিন্তু উদ্ধবের জীবন ও মৃত্যুই এবং তা নিজের প্রতীকী ব্যঞ্জনার গভীরতম তাৎপর্যের সূত্রে জীবনকে বিশেষভাবে দেখার দৃষ্টিতেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণে আসে 'দাও ফিরে সে অরণ্য লহ এ নগর।' রবীন্দ্রনাথ সভ্য জীবনের কৃত্রিমতা, যান্ত্রিকতা, নির্বিকারত্ব হৃদয়হীনতার কথা ভেবেছেন নানা সময় নানা প্রসঙ্গে। গল্পকার উদ্ধবকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে তার মধ্যে 'অরণ্য' অর্থাৎ সহজ, সরল নিষ্পাপ জীবনকে ওতপ্রোত করেছেন। এই Attitude গল্পকারেরই জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি। তাই উদ্ধবের মনোলোক লেখক ভ্রমণ করতে করতে শবর জীবনকে প্রতীক করেছেন সেই উকিল শবরের কোমরে দড়ি বেঁধে পলিশের টান দেওয়ার ভঙ্গিমায়। সে চিত্র তো লেখকেই আঁকা, উদ্ধব তার সফল উপায়। চিত্রটি সংক্ষেপে আবার প্রাসঙ্গিক হয়–

> "সর্বজ্ঞ পুলিশ উকিলদের কোমরের দড়ি টানে। উকিল বড়ো অন্ধকার গহ্বরে ডুবে যেতে যেতে পিছনে চায়। ওই রোহিন করা জমি, শীর্ণ বলদ দুটি। দড়িতে বাঁধা ছাগল, এদের সঙ্গে ওর শেষ দেখা সেরে নেয়।
>
> পুলিশ দড়ি টানে। আজ রাতে ওরা লালকুয়াতে থাকবে, কাল ছোটো দারোগা জিপে ফিরবে। সেপাইদের হেঁটেই ফিরতে হবে। নিমপুর ষোলো মাইল। উকিলরা দড়ির টানে তাড়াতাড়ি যায়। হলদি নালার জলের ঝরঝর ও মৃত উদ্ধবের কথার আবহসঙ্গীত সকল শবরের

বুকে পাথরে পাথরে বাজে।"[১২]

এরপরে, কিছু দ্বিধা কাটিয়ে উকিল কোমরে দড়ি পরতে পরতে বলে, শবর সব! উদ্ধব হিসাবের পাগল বুঝি ছিল না। বুঝি সে পাগল হয়ে তবে সত্যি কথা বলে গেল। আগে বলতে পারে নাই। শবর জীবন হে কাঁকড়ালোকের থাবা নাই এমন তিলেক ভূমি নাই। শত শত বছর বাঁচলেও শবর এক কথাই দেখে। আমাকে কেন দড়ি পরায় বুঝ না ?

এই সামান্য কয়েকটি বাক্যে কয়েকটি শব্দ অসামান্য ব্যঞ্জনা আনে– যা গ্রাম ছাড়িয়ে সুদূর সেই পরিচিত অরণ্য আকাশ সীমা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে যায়। একটি হল বীরগ্রাম আর একটি মাতৃসমা অরণ্য। উদ্ধবের কাছে শবরজীবন। আবার বীরগ্রাম ও তার মাতৃভূমি অরণ্য ঘেরা জীবন। এই হৃদয়নিহিত গভীরতম বাণী বুঝিবা নিরুত্তরে অসীম আর্তি। অনন্ত কৌতূহল ও অপার বিস্ময়বোধকে বাজিয়ে দেয়।

উকিলরা দড়ির টানে তাড়াতাড়ি যায়। হলদিনালার জলের ঝরঝর ও মৃত উদ্ধবের কথার আবহসঙ্গীত সকল শবরের বুকে পাথরে পাথরে বাজে। আর তাতে শুধু বীরগ্রাম নয় অরণ্য পরিবেশ থেকে বিতাড়িত ভারতবর্ষের সমস্ত শবর গ্রামের কাঙ্ক্ষিত হৃদয় নরম শিশির ভেজা ঘাসের মতো ছড়িয়ে যায়। এ যেন উদ্ধবের, গল্পের এবং গল্পকারের একান্ত কাঙ্ক্ষিত বাসনার প্রতীকী রূপ। বস্তুত গল্পের শেষে উদ্ধবের সঙ্গে গল্পকার ও এক হয়ে যায়। তাঁর কল্পনায় এক প্রতিমা– স্বভাব শেষ চিত্রে এমনভাবে কেঁপে ওঠে– যার কম্পনে গোটা গল্পের শক্ত মেরুদণ্ডটি শিল্পের নিখুঁত কারুকর্মে ধন্য হয়। তাই 'উদ্ধবের জীবন ও মৃত্যু' নাম জীবনবাদী গল্পকার মহাশ্বেতা দেবীর অসামান্য সূক্ষ্ম শিল্পবোধের প্রামাণ্য হয়।

তথ্যসূত্র:

১। মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, পঞ্চদশ খণ্ড 'উদ্ধবের জীবন ও মৃত্যু', দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৪০৪.
২। মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, পঞ্চদশ খণ্ড 'উদ্ধবের জীবন ও মৃত্যু', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪০৫.
৩। মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, পঞ্চদশ খণ্ড 'উদ্ধবের জীবন ও মৃত্যু', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪০৬.
৪। মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, পঞ্চদশ খণ্ড 'উদ্ধবের জীবন ও মৃত্যু', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪০৬.
৫। মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, পঞ্চদশ খণ্ড 'উদ্ধবের জীবন ও মৃত্যু', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪১৩.
৬। মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, পঞ্চদশ খণ্ড 'উদ্ধবের জীবন ও মৃত্যু', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪০৪.
৭। মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, পঞ্চদশ খণ্ড 'উদ্ধবের জীবন ও মৃত্যু', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪০৫.
৮। মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, পঞ্চদশ খণ্ড 'উদ্ধবের জীবন ও মৃত্যু', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪১০.
৯। মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, পঞ্চদশ খণ্ড 'উদ্ধবের জীবন ও মৃত্যু', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪০৯.
১০। মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, পঞ্চদশ খণ্ড 'উদ্ধবের জীবন ও মৃত্যু', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪০৪.
১১। মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, পঞ্চদশ খণ্ড 'উদ্ধবের জীবন ও মৃত্যু', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪১০.
১২। মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, পঞ্চদশ খণ্ড 'উদ্ধবের জীবন ও মৃত্যু', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪১৩.